বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

ইতিহাসে মহররম

পবিত্র মহররম মাসের গুরুত্ব ও করনীয়

আসসালামু'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Sisters'Forum In Islam.com

পবিত্র এই মুহররম মাস মনে করিয়ে দেয় সত্যের পথে টিকে থাকার জন্য যারাই চেষ্টা চালিয়েছে মহান আল্লাহ তাদের সাহায্য করেছেন, রক্ষা করেছেন ও সফলতা দান করেছেন। আর সত্যিকার ঈমানদারেরা তখন মহান রবের কৃতজ্ঞতায় আরো বেশী ইবাদাতে মশগুল হয়ে যেতেন।

মহান আল্লাহ বলেন,
আমার আয়াতের প্রতি তো তারাই ঈমান আনে যাদেরকে এ আয়াত শুনিয়ে যখন উপদেশ দেয়া হয় তখন তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং নিজেদের রবের প্রশংসা সহকারে তার মহিমা ঘোষণা করে এবং অহংকার করে না।সূরা আস সাজদাহ: ১৫

তোমাদের আগে অনেক যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। পৃথিবীতে ঘোরাফেরা করে দেখে নাও যারা (আল্লাহর বিধান ও হিদায়াতকে) মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কি হয়েছে।এটি মানব জাতির জন্য একটি সুস্পষ্ট সতর্কবাণী এবং যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য পথনির্দেশ ও উপদেশ। মনমরা হয়ো না, দুঃখ করো না, তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।সূরা আলে ইমরান: ১৩৭-১৩৯

Sisters'Forum In Islam.com

একনজরে মুহাররম মাসের ঘটনাবলী

১। এ মাসকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সম্মানিত ঘোষনা করেছেন,
আল্লাহর মাস বলেছেন এবং এই মাসের সাওম আল্লাহর কাছে প্রিয়।

২। ইসলামের ইতিহাসের ক্যালেন্ডার অর্থাৎ বছরের প্রথম মাস হিসেবে গননা শুরু। যা আমাদের রাসূল স. সহ মুমিন মুহাজিরদের ত্যাগ তিতিক্ষার কথা স্মরন করিয়ে দেয়। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য,প্রিয় রাসূল স.এর ভালোবাসায় উজ্জীবিত হয়ে নিজের প্রিয়জন,প্রিয় বাসস্থান,আত্মীয়-স্বজন ও জন্মভূমিকে ত্যাগ করে ঈমান রক্ষার্থে মুসলিমরা ও মহান আল্লাহর নির্দেশে প্রিয় নবী স. মদিনায় চলে এসেছিলেন যাকে হিজরত বলা হয়।

৩। অত্যাচারী শাসক ফেরাউনের কবল থেকে প্রিয় নবী মুসা আ. ও বনী ইসরাইল জাতীকে রক্ষা করেছিলেন। মুসা আ. এই শাসক ফেরাউনকে আল্লাহর আনুগত্যের দাওয়াত দিয়েছিলেন কিন্তু শাসক গোষ্ঠী সেই দাওয়াত গ্রহন না করে মুসা আ. ও তাঁর অনুসারীদের পাকড়াও করেছিল। মহান রবের অশেষ মেহেরবানীতে ফেরাউনের কবল থেকে মুসা আ. উদ্ধার পেয়েছিলেন। তাই মহান আল্লাহর শুকরিয়া হিসেবে মুসা আ. সাওম রেখেছিলেন।

৪। এইদিনেই হযরত ইমাম হুসাইন রা. ইসলামের ইতিহাসে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা,তার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের পরিবর্তন যেন না আসে, সেই খিলাফাতের ধারা বজায় যেন থাকে, সেই জন্য সত্যের ধারক হয়ে কারবালায় শহীদ হয়েছিলেন।

Sisters’Forum In Islam.com

জালিম সাম্রাজ্য যত শক্তিশালী হোক না কেন, যত বর্বর ও পিশাচ হোক না কেন তার পতন হবেই। যদি আমরা সত্যিকারার্থে ঈমানদার হই ও জালেম সাম্রাজ্য ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ধৈর্যের সাথে অটল থাকতে পারি। আর মুসা আ. ও তার অনুসারীরা মহরমের ১০ তারিখে তো ফেরআউনী সাম্রাজ্যকে পরাজিত করেছিলেন আল্লাহর সাহায্যে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ মুসা তার সম্প্রদায়কে বলল, 'আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য ধারণ কর; এ পৃথিবীতো আল্লাহরই। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার উত্তরাধিকারী করেন এবং শেষ ফলাফল তো মুত্তাকীদের পক্ষে। সূরা আরাফ : ১২৮

মহান আল্লাহর সাহায্য ও সত্যের বিজয়

ফেরআউনের কবল থেকে মুসা আ. ও তার জাতির মুক্তি ছিল আল্লাহ তাআ'লার এক বড় নেয়ামত। আল কুর'আন থেকে জানা যায়-

আর (আল্লাহ বলেন): সেই সময়ের কথা স্মরণ করো যখন আমি ফেরাউনের লোকদের কবল থেকে তোমাদের মুক্তি দিয়েছিলাম, যারা তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি দিতো, তোমাদের ছেলেদের হত্যা করতো এবং মেয়েদের জীবিত রাখতো। আর এর মধ্যে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য ছিল মহা পরীক্ষা।সূরা আল আরাফ:১৪১

যাও, তোমরা দুজন(মুসা আ. ও তাঁর ভাই হারুন আ.) ফেরাউনের কাছে, সে বিদ্রোহী হয়ে গেছে। তার সাথে কোমলভাবে কথা বলো, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভীত হবে।সূরা ত্বাহা :৪৩-৪৪

যাও তার কাছে এবং বলো, আমরা তোমার রবের প্রেরিত, বনী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে যাওয়ার জন্য ছেড়ে দাও এবং তাদেরকে কষ্ট দিয়ো না। আমরা তোমার কাছে নিয়ে এসেছি তোমার রবের নিদর্শন এবং শান্তি তার জন্য যে সঠিক পথ অনুসরণ করে। আমাদের অহীর সাহায্যে জানানো হয়েছে যে, শাস্তি তার জন্য যে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। ফেরাউন বললো, আচ্ছা, তাহলে তোমাদের দুজনের রব কে হে মূসা? মূসা জবাব দিল, আমাদের রব তিনি যিনি প্রত্যেক জিনিসকে তার আকৃতি দান করেছেন তারপর তাকে পথ নির্দেশ দিয়েছেন।সূরা ত্বাহা:৪৭-৫০

আমি ফেরাউনকে আমার সমস্ত নিদর্শন দেখালাম কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করতে থাকলো এবং মেনে নিল না।সূরা ত্বাহা:৫৬

আর ফেরাউন বললো, হে সভাসদবর্গ! তো আমি নিজেকে ছাড়া তোমাদের আর কোন প্রভু আছে বলে জানি না। ওহে হামান! আমার জন্য ইট পুড়িয়ে একটি উঁচু প্রাসাদ তৈরি করো, হয়তো তাতে উঠে আমি মূসার প্রভুকে দেখতে পাবো, আমিতো তাঁকে মিথ্যুক মনে করি। সে এবং তার সৈন্যরা পৃথিবীতে কোন সত্য ছাড়াই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার করলো এবং মনে করলো তাদের কখনো আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না। শেষে আমি তাকে ও তার সৈন্যদেরকে পাকড়াও করলাম এবং সাগরে নিক্ষেপ করলাম। এখন এ জালেমদের পরিণাম কি হয়েছে দেখে নাও।সূরা কাসাস: ৩৮-৪০

দেখো, ফেরাউন যখন সে রসূলের কথা মানলো না তখন আমি তাকে কঠোরভাবে পাকড়াও করলাম। তোমরা যদি মানতে অস্বীকার করো তাহলে সেদিন কিভাবে রক্ষা পাবে যেদিনটি শিশুকে বৃদ্ধ বানিয়ে দেবে? যেদিনের কঠোরতায় আকাশ মণ্ডল বিদীর্ণ হয়ে যেতে থাকবে? আল্লাহর প্রতিশ্রুতি তো পূর্ণ হবেই। এ একটি উপদেশ বাণী। অতএব যে চায় সে তার প্রভুর পথ অবলম্বন করুক।সূরা মুযযাম্মীল:১৬-১৯

শেষ পর্যন্ত ফেরাউন মূসা ও বনী ইস্রাঈলকে দুনিয়ার বুক থেকে উৎখাত করার সংকল্প করলো। কিন্তু আমি তাকে ও তার সঙ্গী-সাথীদেরকে এক সাথে ডুবিয়ে দিলাম।সূরা বনী ইসরাইল:১০৩

আমি মূসার কাছে অহী পাঠালাম যে, এবার রাতারাতি আমার বান্দাদের নিয়ে বের হয়ে পড়ো এবং তাদের জন্য সাগরের বুকে শুকনা সড়ক বানিয়ে নাও। কেউ তোমাদের পিছু নেয় কিনা সে ব্যাপারে একটুও ভয় করো না এবং (সাগরের মাঝখান দিয়ে পার হতে গিয়ে) শংকিত হয়ো না। পিছন থেকে ফেরাউন তার সেনাবাহিনী নিয়ে পৌঁছলো এবং তৎক্ষণাত সমুদ্র তাদের উপর ছেয়ে গেলো যেমন ছেয়ে যাওয়া সমীচীন ছিল। ফেরাউন তার জাতিকে পথভ্রষ্ট করেছিল, কোন সঠিক পথ দেখায়নি।সূরা ত্বাহা:৭৭-৭৯

এ মুক্তির পর তিনি সাওম পালন করে আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করার প্রয়াস পেয়েছেন। কেননা নেক আমল হল আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায়ের বড় মাধ্যম।যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ"হে দাউদ পরিবার! শুকরিয়া হিসেবে তোমরা নেক আমল করতে থাক। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই শুকরিয়া আদায়কারী রয়েছে।"সূরা সাবা: ১৩

হিজরী সন গননা কেনো ও কখন থেকেঃ

হযরত উমর রা. তাঁর রাজত্বকালে যখন ইসলামি খেলাফতের পরিধি অনেক বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল, তাঁর নিকট বিভিন্ন স্টেট থেকে সময় তারিখ উল্লেখ বিহীন অনেক চিঠিপত্র আসতে লাগল, তখন প্রত্যেক চিঠিকে আলাদা আলাদা ভাবে চিহ্নিত করা এবং লেখার তারিখ ও সময় সম্পর্কে অবহিত হয়ে কাজে শৃঙ্খলা ও গতি আনার জন্যে চিঠিতে তারিখ লাগানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল।

হিজরি সালের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলো উমর রা এর শাসনামলে। হযরত উমর রা. এর খেলাফত কালে যখন ইসলামী সনের প্রচলনের বিষয় আলোচনা হচ্ছিল তখন কোন এক ব্যক্তি প্রস্তাব করেছিলেন যে ইসলামী সন রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্ম দিন থেকে শুরু করা যেতে পারে। তখন এ প্রস্তাব প্রায় সকল সাহাবা আযমাইন রা এ বলে প্রত্যাখ্যান করলেন যে, এটা খৃষ্টানদের নিয়ম-নীতির মধ্যে পড়ে। তারা তাদের নবীর জন্ম দিন থেকে সন গণনা করেছে। আমরা তা করবোনা। আমরা আমাদের নবীর হিজরত থেকে সন গণনা করবো। (উসূলুদ্দাওয়াহ)

হিজরি বৎসর ও তারিখ প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন দাপ্তরিক কাজে শৃঙ্খলা রক্ষার্থে চুক্তি ও সম্পাদন যোগ্য বিষয়াবলীর একটি থেকে অপরটিকে পৃথক করে সামঞ্জস্য বিধান।

উমর রা. সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করলেন সাহাবারা হিজরতের (রাসূল সা. যে বছর মহান আল্লাহর নির্দেশে মক্কা থেকে মদীনায় চলে এসেছিলেন) বৎসরকে হিজরি তারিখের সূচনা করে নতুন গণনা শুরু করার পরামর্শ দিলেন এবং তৎকালীন বিদ্যমান থাকা মীলাদী (ঈসায়ী) তারিখকে বাদ দিয়ে হিজরতকে প্রথম ধরে হিজরি সনের প্রবর্তন করলেন। এর ফলে যুক্তি ও লেখার সময় জানা থাকে এবং কাজ সুশৃঙ্খল ও গতিশীল হয়। এটিই ছিল হিজরি সন প্রবর্তনের মূল কারণ।
হিজরি তারিখের প্রবর্তনের উদ্দেশ্যও এ ছিল না যে, শুরু বর্ষকে লোকেরা এটি উপলক্ষ বানাবে। একে অপরকে অভিনন্দন জানাবে। বিভিন্ন উপায়ে উদযাপন করবে, উৎসব করবে, আলোচনা করবে। এটিকে একটি উপলক্ষ বানিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান-উৎসব উদযাপন করে বিদয়াতের রাস্তা ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে এর প্রবর্তন হয়নি। (সুনান খ্যাত গবেষক শায়খ সালেহ আল ফাউযান)।
মক্কা থেকে হিজরতের মাধ্যমে মদিনায় ইসলামের প্রচার ঘটেছে, ইসলামের প্রথম রাষ্ট্র কায়েম হয়েছে এবং দলে দলে মানুষ ইসলাম কবুল করেছে। আল কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে, যখন আল্লাহর সাহায্য এসে যায় এবং বিজয় লাভ হয়,আর (হে নবী!) তুমি (যদি) দেখ যে লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীন গ্রহণ করছে তখন তুমি তোমার রবের হামদ সহকারে তাঁর তাসবীহ পড়ো এবং তাঁর কাছে মাগফিরাত চাও। অবশ্যি তিনি বড়ই তাওবা কবুলকারী। সূরা আন নসর
সাহাবাগন দলে দলে হিজরত করেছেন কিন্তু আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপেক্ষা করছিলেন আল্লাহর নির্দেশের। কারন মক্কায় তিনি অমানবিক যন্ত্রনা ও নির্যাতন ভোগ করেছেন। শুধু তিনিই নন, অসহায় দাসদাসি ও অন্যান্য সাহাবাগন যারাই ঈমান এনেছে তাদের উপর অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার করা হয়েছে।
যেদিন তিনি মক্কা ত্যাগ করছেন সেদিন তার হৃদয়ে এক মর্মপীড়ার কারন। সব স্মৃতিকে বিসর্জন দিয়ে চলে গিয়েছিলেন একমাত্র আল্লাহর নির্দেশ পালন ও দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। সাহাবাদের অনেকে ধনাঢ্য ব্যাক্তি ছিলেন। তারা তাদের সমস্ত সম্পদ বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর দ্বীনকে উঁচু করার জন্য হিজরত করেছিলেন। এই হিজরতের মাধ্যমে তিনি নতুন একটি মুসলিম সমাজের গোড়াপত্তন করলেন। আজকের মক্কা ও মদিনার চিত্র দেখে কি আমাদের মনে আসে না এই স্থানগুলোতে আল্লাহর রাসুল সা. ও সাহাবা আযমাইন রা. এর ত্যাগের কত ঘটনা মিশে আছে! সারা বিশ্বে আজানের সুমধুর ডাক শুনে কি মনে হয় না, কত পরিশ্রম, ত্যাগ তিতিক্ষার ফসল এই আজান!
সেজন্য যখনি আমাদের কাছে একটি বছর ফিরে আসে আমাদের স্মরন করা দরকার হিজরি সনের অতীত ইতিহাসকে। এটি আমাদের ঈমান ও আকীদার প্রান সঞ্চার করে। রসূল সা. ও সাহাবা কেরাম যে দ্বীনের জন্য পার্থিব সবকিছু ছেড়ে হিজরত করেছেন, আমরা কতটুকু দ্বীনের জন্য কুরবানি করছি সেটিই ভাবার বিষয়। আমাদের জীবনের সময়গুলো সমাজ ও মানুষের কল্যানে কতটুকু ব্যয় করছি তার পরিমাপ করার জন্য আমাদের পর্যালোচনা দরকার। অতীত একটি বছর যদি আমাদের কর্মে থাকে কল্যান আর কল্যান তাহলে আমরা স্বার্থক হলাম। আর যদি না করা হয় তার জন্য অনুশোচনা ও আগামি বছর হায়াত পেলে সামনের দিনগুলো পর্যালোচনায় পরিকল্পনায় নতুন উদ্দীপনায় আমরা আমাদের তৈরি করতে পারি। আল্লাহর রসূল সা. ও সাহাবায়ে কেরাম রা যতটুকু দ্বীনের খেদমত করেছেন তা উম্মতের কারো পক্ষেই করা সম্ভব নয়। তবে উনাদের অনুসরন করে আমাদের সময়গুলোকে কাজে লাগানোর অংগীকার আমরা করতে পারি। সুন্দর সমাজ নির্মানে দায়িত্ব পালনের জন্য সবারই এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

হিজরী সন গননা কেনো ও কখন থেকেঃ

যে মসজিদে প্রথম দিন থেকে তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল সেই মসজিদটি দাঁড়ানোরই (ইবাদতের জন্য) তোমার পক্ষে অধিকতর সমীচীন। সেখানে এমন লোক আছে যারা পাক -পবিত্র থাকা পছন্দ করে এবং আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন। সূরা তওবা : ১০৮)

হিজরতের বছর গননা সেইদিন থেকেই।

আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানি (রহ.) লিখেছে, ‘সাহাবায়ে কেরাম বর্ষ গণনার ক্ষেত্রে হিজরতকে প্রাধান্য দিয়েছেন সুরা তাওবার ১০৮ নম্বর আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে। সেখানে প্রথমদিন থেকে তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত মসজিদে নামাজ আদায় করতে বলা হয়েছে। এই ‘প্রথমদিন’ ব্যাপক নয়। এটি রহস্যাবৃত। এটি সেই দিন, যেদিন ইসলামের বিশ্ব জয়ের সূচনা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) নিরাপদে, নির্ভয়ে নিজ প্রভুর ইবাদত করেছেন। মসজিদে কুবার ভিত্তি স্থাপন করেছেন। ফলে সেদিন থেকে সন গণনার বিষয়ে সাহাবায়ে কেরাম মতৈক্যে পৌঁছেছেন। এ ছাড়া মহানবী (সা.)-এর জন্ম, নবুয়ত, হিজরত ও ওফাত এ চারটির মাধ্যমে বর্ষ গণনা করা যেত। কিন্তু জন্ম ও নবুয়তের সন নিয়ে ব্যাপক মতপার্থক্য আছে, আর মৃত্যু শোকের স্মারক। তাই অগত্যা হিজরতের মাধ্যমেই বর্ষ গণনা শুরু করা হয়। (ফতহুল বারি : ৭/২৬৮)

হিজরত’ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। হিজরত শব্দটির একটি সাধারণ অর্থ এবং একটি পারিভাষিক অর্থ রয়েছে। হিজরতের সাধারণ অর্থ আল্লাহর সন্তু’ষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো বস্তু, স্থান বা ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করা, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। এই অর্থটি ব্যাপক। এই ব্যাপক অর্থেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (তরজমা) ‘প্রকৃত মুহাজির সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর বারণকৃত বস্তুকে পরিত্যাগ করে। (সহীহ বুখারী : ১০)

অপর একটি হাদীসে এসেছে, নবীজীকে প্রশ্ন করা হল, কোন হিজরত উত্তম? তখন তিনি বললেন, তোমার রবের অপছন্দীয় বস্তু ছেড়ে দেয়া। মুসনাদে আহমদ ২/১৬০ হাদীস : ৬৪৮৭

Sisters’Forum In Islam.com

১ম মাস হিসেবে মহররম কেনো -

মহানবী (সা.)-এর হিজরতের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আরবি রবিউল আউয়াল মাসে। তাহলে হিজরি ক্যালেন্ডারে প্রথম মাস হিসেবে মহররমকে নির্বাচন করার কারণ কী?

এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে কাসির (রহ.) লিখেছেন, সাহাবায়ে কেরাম হিজরতের দিন থেকেই বর্ষ গণনা শুরু করলেন। আর মহররমকে প্রথম মাস হিসেবে স্বীকৃতি দিলেন। কেননা তৎকালীন আরবে মহররমই প্রথম মাস হিসেবে পরিচিত ছিল। জনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির যাতে বিঘ্ন না হয়, সে জন্য এটিকে পরিবর্তন করা হয়নি। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৪/৫১৩)।
আল্লামা ইবনে হাজর (রহ.) লিখেছেন, রবিউল আউয়ালকে বাদ দিয়ে মহররম থেকে সন গণনা শুরু করা হয়েছে। কেননা হিজরতের সূচনা ও সিদ্ধান্ত হয়েছে মহররম থেকে। আর আকাবার দ্বিতীয় শপথও হয়েছে মধ্য জিলহজে। আর আকাবার দ্বিতীয় শপথ হিজরতকে ত্বরান্বিত করে। আর এ ভাঙা মাসের পর নতুন চাঁদ উদিত হয়েছে মহররম মাসে। তাই একে দিয়েই বছর গণনা শুরু করা হয়েছে। আমার জানা মতে, এটিই শক্তিশালী অভিমত। (ফতহুল বারি : ৭/২৬৮)।

Sisters'Forum In Islam.com

হিজরত শব্দের অর্থ কি?

হিজরত আরবী শব্দ। হিজরুন শব্দ হতে মাসদার এটি। এর মূল বর্ণ হা, জীম, রা। এর অর্থ হচ্ছে ত্যাগ করা, ছেড়ে দেওয়া, ছিন্ন করা, পরিত্যাগ করা, সম্পর্ক শেষ করা, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যাওয়া, দেশত্যাগ করা ইত্যাদি।

'হিজরত' ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। হিজরত শব্দটির একটি সাধারণ অর্থ এবং একটি পারিভাষিক অর্থ রয়েছে। হিজরতের সাধারণ অর্থ আল্লাহর সন্তু'ষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো বস্তু, স্থান বা ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করা, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। এই অর্থটি ব্যাপক।

এই ব্যাপক অর্থেই নবীজী সা বলেছেন, 'প্রকৃত মুহাজির সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর বারণকৃত বস্তুকে পরিত্যাগ করে। (সহীহ বুখারী,১০)

অপর একটি হাদীসে এসেছে, নবীজীকে প্রশ্ন করা হল, কোন হিজরত উত্তম? তখন তিনি বললেন, তোমার রবের অপছন্দীয় বস্তু ছেড়ে দেয়া। মুসনাদে আহমদ ২/১৬০ হাদীস : ৬৪৮৭

জ্ঞানার্জন, দাওয়াত-তাবলীগ ও জিহাদের জন্য দেশ থেকে সফর করাও হিজরতের এই ব্যাপক ও সাধারণ অর্থের অন্তর্ভুক্ত। যেমন একটি হাদীসে এসেছে, নবীজীকে প্রশ্ন করা হল, হিজরত কী? তিনি বললেন, পাপ ছেড়ে দেওয়া। প্রশ্নকারী বললেন, কোন হিজরত উত্তম? নবীজী বললেন, জিহাদ ...। -মুসনাদে আহমদ ৪/১১৪ হাদীস ১৭০২৭

উল্লেখ্য যে, এই ব্যাপক অর্থের হিজরতের জন্য নির্দিষ্ট কোন সময় নেই; বরং তা তো একজন মুমিন বান্দার সার্বক্ষণিক আমল। কিন্তু হিজরত যা শরীয়তের একটি 'বিশেষ পরিভাষা' তার অর্থ হল, 'স্বীয় দ্বীন ও ঈমানের সুরক্ষা ও নিরাপদভাবে তার ইবাদতে মগ্ন হওয়ার জন্য আল্লাহ ও তার রাসূলের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দারুল হারব বা দারুল খাওফ অর্থাৎ কুফরী ভূখণ্ড বা অনিরাপদ ভূখণ্ড ত্যাগ করে দারুল ইসলাম বা দারুল আমন অর্থাৎ ইসলামী ভূখণ্ড বা নিরাপদ ভূখণ্ডে গমন করা। ইসলামের ইতিহাসে মহানবী (সাঃ) এর আদেশে সাহাবায়ে কেরাম এবং তিনি নিজেও হিজরত করেছেন। এটি ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে ঈমানী দৃঢ়তা, একনিষ্ঠতা ও আত্মত্যাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। মোটকথা, ইসলামের অস্তিত্বের জন্য হিজরত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

মহররম মাসের গুরুত্বঃ

إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِى كِتَـٰبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ ٩ : ٣٦
أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا۟ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَـٰتِلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَـٰتِلُونَكُمْ كَآفَّةً ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟
أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ

আশহুরে হুরুম তথা হারামকৃত মাস চতুষ্টয়ের অন্যতম। আশহুরে হুরুম সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা বলেন, নিশ্চয় মাসসমূহের গণনা আল্লাহর কাছে বার মাস আল্লাহর কিতাবে, (সেদিন থেকে) যেদিন তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্য থেকে চারটি সম্মানিত, এটাই প্রতিষ্ঠিত দীন। সুতরাং তোমরা এ মাসসমূহে নিজেদের উপর কোন জুলুম করো না। সূরা তাওবা: ৩৬

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,
বছর হলো বারোটি মাসের সমষ্টি, তার মধ্যে চারটি অতি সম্মানিত। তিনটি পর পর লাগোয়া যিলকদ, যিলহজ্জ ও মুহররম আর (চতুর্থটি হলো) জুমাদাস সানি ও শাবানের মধ্যবর্তী রজব। আল বুখারি: ২৯৫৮

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, রামাদানের পর সর্বোত্তম সাওম হচ্ছে আল্লাহর মাস মুহররম (মাসের সাওম)।
সহিহ মুসলিম: ১৯৮২

Sisters'Forum In Islam.com

মহররম মাসে করণীয়-১

১। কৃতজ্ঞতা পেশঃ

মহান রবের অশেষ মেহেরবানীতে ফেরাউনের কবল থেকে মুসা আ. উদ্ধার পেয়েছিলেন। এ মুক্তির পর তিনি সাওম পালন করে আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করার প্রয়াস পেয়েছেন। কেননা নেক আমল হল আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায়ের বড় মাধ্যম।

যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ

"হে দাউদ পরিবার! শুকরিয়া হিসেবে তোমরা নেক আমল করতে থাক। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই শুকরিয়া আদায়কারী রয়েছে।"সূরা সাবা: ১৩

শুকরিয়া আদায়ের অর্থ হল যে অনুগ্রহ করেছে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

• পাঁচটি বিষয়ের উপর আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া আদায়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

সে গুলো হলঃ

এক. নেয়ামত দাতা আল্লাহর প্রতি বিনয়াবনত হওয়া।

দুই. নেয়ামত দাতা আল্লাহকে মহব্বত করা।

তিন. নেয়ামতকে মনে প্রাণে গ্রহণ ও স্বীকার করা।

চার. মুখ দ্বারা নেয়ামত দাতা আল্লাহর প্রশংসা করা।

পাঁচ. নেয়ামতকে নেয়ামত দানকারী আল্লাহর অসন্তুষ্টিতে ব্যবহার না করা বরং তাঁর সন্তুষ্টির পথে তা ব্যয় করা।(মাদারেজুস সালেকীন)

মহররম

মাসে

করনীয়ঃ ২

২। সাওমঃ

আশুরার সাওমের ফযিলতঃ ১

আবু হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলে: রসূলুল্লাহ স. বলেছেনঃ রামাদানের পর সর্বোত্তম সাওম হল আল্লাহর প্রিয় মুহাররম মাসের সাওম। এবং ফরয সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হল রাতের সালাত. সহিহ মুসলিম

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘রমযানের পর আল্লাহর মাস মুহাররমের রোযা হল সর্বশ্রেষ্ঠ।’

أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم -সহীহ মুসলিম ২/৩৬৮; জামে তিরমিযী ১/১৫৭

আরবী আশারা অর্থ দশ।

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আগমন করে দেখতে পেলেন ইহুদিরা আশুরার দিন সাওম পালন করছে। নবীজী বললেন, এটি কি? তারা বলল, এটি একটি ভাল দিন। এ দিনে আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলকে তাদের দুশমনের কবল থেকে বাঁচিয়েছেন। তাই মুসা আ. সাওম পালন করেছেন। রাসূলুল্লাহ স.বললেন, মুসাকে অনুসরণের ব্যাপারে আমি তোমাদের চেয়ে অধিক হকদার। অত:পর তিনি সাওম রেখেছেন এবং সাওম রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।সহিহ আল বুখারি:১৮৬৫

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন জাহেলী যুগে কুরাইশরা আশুরার সাওম পালন করত এবং রসূলুল্লাহ স.ও সাওম পালন করতেন। যখন তিনি মদীনায় হিজরত করলেন তখন তিনি এ সাওম পালন করলেন ও অন্যদের পালন করতে আদেশ দিলেন। যখন রামাদান মাসের সাওম ফরয হল তখন তিনি আশুরার সাওম সম্পর্কে বললেনঃ যার ইচ্ছা আশুরার সাওম পালন করবে, আর যার ইচ্ছা ছেড়ে দিবে। বুখারী ও মুসলিম

আশুরার সাওমের ফযিলতঃ ২

মহররম

মাস

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,
আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাওম রাখার জন্য এত অধিক আগ্রহী হতে দেখিনি যত দেখেছি এই আশুরার দিন এবং এই মাস অর্থাৎ রামাদান মাসের সাওমের প্রতি। সহিহ আল বুখারি:১৮৬৭

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,
আশুরার দিনের সাওমের ব্যাপারে আমি আল্লাহর কাছে আশা করি, তিনি পূর্ববর্তী এক বছরের পাপ ক্ষমা করে দেবেন। সহিহ মুসলিম:১৯৭৬

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. বর্ণনা করেন,
অর্থাৎ, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুরার সাওম রাখলেন এবং (অন্যদেরকে) সাওম রাখার নির্দেশ দিলেন। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এটিতো এমন দিন, যাকে ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা বড় জ্ঞান করে, সম্মান জানায়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আগামী বছর এদিন আসলে, আমরা নবম দিনও সাওম রাখব ইনশাল্লাহ। বর্ণনাকারী বলছেন, আগামী বছর আসার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয়ে গিয়েছে। সহিহ মুসলিম:১৯১৪৬

আশুরার সাওমের ফযিলতঃ ৩

মহররম

মাস

ইমাম শাফে‘ঈ ও তার সাথীবৃন্দ, ইমাম আহমাদ, ইমাম ইসহাক প্রমুখ বলেছেন, আশুরার সাওমের ক্ষেত্রে দশম ও নবম উভয় দিনের সাওম-ই মুস্তাহাব। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ তারিখ সাওম রেখেছেন এবং নয় তারিখ সাওম রাখার নিয়ত করেছেন।

এর-ই ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, আশুরার সাওমের কয়েকটি স্তর রয়েছে: সর্ব নিম্ন হচ্ছে কেবল দশ তারিখের সাওম রাখা। এরচেয়ে উচ্চ পর্যায় হচ্ছে তার সাথে নয় তারিখের সাওম পালন করা। এমনিভাবে মুহররম মাসে সাওমের সংখ্যা যত বেশি হবে মর্যাদা ও ফযীলতও ততই বাড়তে থাকবে।

তাসু‘আর(৯ইমহররম) সাওম মুস্তাহাব হবার হিকমতঃ

ইমাম নাওয়াবী রহ. বলেন, তাসু‘আ তথা মুহররমের নয় তারিখ সাওম মুস্তাহাব হবার হিকমত ও উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে প্রাজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন,

এক. এর উদ্দেশ্য হলো, ইয়াহূদীদের বিরোধিতা করা। কারণ তারা কেবল একটি অর্থাৎ দশ তারিখ সাওম রাখত।

দুই. আশুরার দিনে কেবলমাত্র একটি সাওম পালনের অবস্থার উত্তরণ ঘটিয়ে তার সাথে অন্য একটি সাওমের মাধ্যমে সংযোগ সৃষ্টি করা। যেমনি করে এককভাবে জুমু‘আর দিন সাওম রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। এটি আল্লামা খাত্তাবী ও অন্যান্যদের মত।

তিন. দশ তারিখের সাওমের ক্ষেত্রে চন্দ্র গণনায় ত্রুটি হয়ে ভুলে পতিত হবার আশংকা থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে। হতে পারে গণনায় নয় তারিখ কিন্তু বাস্তবে তা দশ তারিখ।

এর মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী তাৎপর্য হচ্ছে, আহলে কিতাবের বিরোধিতা করা। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু হাদীসে আহলে কিতাবদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে নিষেধ করেছেন। যেমন, আশুরা প্রসঙ্গে বলেছেন, “ لَئِنْ عِشْتُ إِلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ আমি যদি আগামী বছর বেঁচে থাকি তাহলে অবশ্যই নয় তারিখ সাওম রাখব”।

আল-ফতোয়াল কোবরা, খণ্ড ৬

Sisters’Forum In Islam.com

মহররম

মাসে

করনীয়ঃ ৩

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ .

হে ঈমানদার বান্দারা, তোমরা আল্লাহ তা'লার নিদর্শনসমূহের অসম্মান করো না, সম্মানিত মাসগুলোকেও না। সূরা আল মায়েদা: ২

মহররম মাসে আরো করনীয়ঃ

১। নিজের ও অন্যের উপর যুলুম করা থেকে বিরত থাকা
২। ফরয ওয়াজিব ইহসানের সাথে পালন করা
৩। তাওবা ইস্তিগফারে অন্তরকে জাগ্রত রাখা
৪। রবের স্মরনে যিকরে অভ্যস্থ হওয়া
৫। দান সাদাকা করা
৬। অন্যের কল্যানে সদা প্রস্তুত থাকা
৭। মিথ্যার কাছে মাথা নত না করা, সত্য ও সত্য সাক্ষীর উপর অটল থাকা।
৮। হক কথা প্রচার করা ও অন্যায় থেকে বিরত রাখার প্রচেষ্টায় থাকা।

খেলাফতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

নবীজির ওফাতের পর ‘‘বাই‘আতের মাধ্যমে আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু) ১ম খলিফা নিযুক্ত হন। তিনি দীর্ঘ ২ বছর, ৩ মাস, ১০ দিন খিলাফতের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে ১৩ হিজরিতে রফিকে আ‘লার ডাকে সাড়া দেন। ।

এরপর আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু) এর বিশেষায়িত হিসেবে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু) ২য় খলিফা নিযুক্ত হন। তিনি দীর্ঘ ১০ বছর ৬ মাস ১০ দিন খিলাফতের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে ২৩ হিজরীতে রফিকে আ‘লার ডাকে সাড়া দেন। ।

ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু) মৃত্যুর পূর্বে খেলাফতের দায়িত্ব ৬ জন শূরার কাছে রেখে যান। শূরার পরামর্শক্রমে হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু) ৩য় খলিফা নিযুক্ত হন। তিনি দীর্ঘ ১১ বছর ১১ মাস ২৮ দিন খেলাফতের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে ৩৫ হিজরিতে রফিকে আ‘লার ডাকে সাড়া দেন। ((উল্লেখ্য, সাবাঈদের পূর্ণরুপে উত্থান শুরু হয়েছিলো হযরত উসমান রাযি. এর খেলাফত কালে। এই ভদ্র ও নম্র স্বভাবের সাহাবী ও খলীফাকে তারা টার্গেট করেই শহীদ করে। তাদের এই হত্যাযজ্ঞ গড়াতে গড়াতে হযরত উসমান হত্যা, জঙ্গে জামাল, জঙ্গে সিফফিন, হযরত আলীর শাহাদাত, হযরত হুসাইন ও আহলে বাইতের শাহাদাত পর্যন্ত গড়ায়। খিলাফত ধ্বংসের প্রকৃত ইতিহাস নিয়ে পড়লে বিস্তারিত জানা যাবে।))

এরপর মুহাজির সাহাবাদের বাই‘আতের মাধ্যমে হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু) ৪র্থ খলিফা নিযুক্ত হন। তিনি দীর্ঘ ৪ বছর ৯ মাস খেলাফতের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে ৪০ হিজরিতে রফিকে আ‘লার ডাকে সাড়া দেন।

চতুর্থ খলিফা আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) এর শাহাদাতের পর, কুফার (ইরাকের) জনগণ পরবর্তী খলিফা হিসেবে তার বড় ছেলে হাসান ইবনে আলী (রাঃ) এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। কিন্তু মুয়াবিয়া (রাঃ) এবং হাসান (রাঃ) এর মধ্যে কিছু মতপার্থক্য ছিল। এক পর্যায়ে, হাসান (রাঃ) একটি শান্তি চুক্তির মাধ্যমে মুয়াবিয়া (রাঃ) এর কাছে খেলাফতের দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। সেই চুক্তিতে বেশ কয়েকটি ধারা রয়েছে। ----

মুয়াবিয়া (রাঃ) পরবর্তী খলিফা মনোনীত করবেন না। শুরা কমিটি পরবর্তী খলিফা নির্বাচন করবে।

যদি হাসান (রাঃ) বেঁচে থাকেন এবং মুয়াবিয়া (রাঃ) মারা যান, তাহলে হাসান (রাঃ) পরবর্তী খলিফা হতেন।

হাসান (রাঃ)-কে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয় এবং মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর পুত্র ইয়াজিদকে পরবর্তী উমাইয়া খিলাফত নিযুক্ত করেন। কিন্তু হুসাইন (রাঃ)-সহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ বিশিষ্ট সাহাবী ইয়াজিদের ক্ষমতার উত্তরাধিকারকে সমর্থন করেননি। তাই, ইয়াজিদের ক্ষমতার শুরু থেকেই, হুসাইন (রাঃ)-এর এবং ইয়াজিদের মধ্যে কিছু মতপার্থক্য ছিল।

মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) দীর্ঘ ৪১ থেকে ৬০ হিজরী পর্যন্ত ২০ বছর দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে ৬০ হিজরিতে রফিকে আ‘লার ডাকে সাড়া দেন।

কারবালার প্রান্তরে হুসাইন (রাঃ)এর শাহাদাত বরণ করার প্রকৃত ঘটনা: ১

হযরত মুয়াবিয়া রা মৃত্যুর আগে একাধিক সাহাবার পরামর্শ মতে ইয়াযিদকে শাসন ক্ষমতায় ন্যস্ত করে যান (প্রায় ১০টি শর্ত দিয়ে)। এই শর্তগুলো মুয়াবিয়া ((রাযি.))–এর ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যাতের পরিচয় বহণ করে। এবং ইয়াযিদকে পরবর্তী খলীফা মনোনয়নের ক্ষেত্রেও স্পষ্ট। মৃত্যুর আগে তিনি ইয়াযিদকে ১০টি গুরুত্বপূর্ণ অসিয়ত করেছিলেন, যাতে ছিল একটি শাসকের জন্য পথনির্দেশনা ও আত্মসংশোধনের আহ্বান।

১. আল্লাহকে ভয় করবে; খিলাফতের দায়িত্ব তোমাকে অর্পণ করেছি, এ এক মহান আমানত।
২. ভালোভাবে দায়িত্ব পালন করলে তা আমার সৌভাগ্য, আর ব্যর্থ হলে সেটা তোমার দুর্ভাগ্য।
৩. জনগণের সঙ্গে সদাচরণ ও নম্রতা অবলম্বন করবে।
৪. নিজের বিরুদ্ধে সমালোচনা ও নিন্দা শুনলে উপেক্ষা করবে।
৫. সমাজের প্রভাবশালী ও অভিজাতদের প্রতি কঠোর হবে না; তাদের সম্মান রক্ষা করে নিকটবর্তী রাখবে।
৬. প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অভিজ্ঞ, ধার্মিক ও পরহেযগারদের পরামর্শ গ্রহণ করবে এবং তাদের মতামত উপেক্ষা করবে না।
৭. একগুঁয়েমি থেকে দূরে থাকবে; একমাথার চিন্তা সঠিক সিদ্ধান্তের নিশ্চয়তা নয়।
৮. নিজের নফসের সংশোধনে সচেতন থাকবে, তাহলেই মানুষও তোমার সঙ্গে ভালো আচরণ করবে।
৯. এমন কিছু করবে না, যাতে মানুষের অভিযোগের সুযোগ থাকে; কারণ, মন্দ খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।
১০. জামাতে নামায আদায়ে মনোযোগী থাকবে।

শেষে তিনি বলেছিলেন: "এই উপদেশগুলো অনুসরণ করলে জনগণ তোমার হক বুঝবে এবং তোমার শাসন সুদৃঢ় হবে।" (আল-বিদায়া ওয়ান্-নিহায়া: ১১/৬৪৪–৬৪৫)

কারবালা পরিচিতি:

“ ;كربلاء কারবালা” ইরাকের অন্তর্গত একটি শহর। এটি বাগদাদের ১০০ কি.মি. (৬২ মাইল) দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। শহরটি কারবালা প্রদেশের রাজধানী।

কারবালা মূলত ঐতিহাসিক কারবালার যুদ্ধের কারণে বেশি পরিচিত। ইয়াযিদের শাসন আমলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৌহিত্র ও হযরত আলী রাযি. এর পুত্র হযরত হুসাইন ইবনে আলী এই শহরে নির্মমভাবে শাহাদাতবরণ করেন। এজন্য এই ঘটনার মূল বিষয় দুজনকে ঘিরে। ১. হযরত হুসাইন ইবনে আলী রাযি., ২. ইয়াযিদ ইবনে মুয়াবিয়া,

রাসূল স. এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের নেতৃত্বে চল্লিশ বছর পর্যন্ত যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তার শাসনতন্ত্রের মৌলিক বিশেষত্ব লোপ পেতে যাচ্ছিল ইয়াযিদের উত্তরাধিকারসূত্রে কর্তৃত্ব দখলের দ্বারা।

হযরত আবু বকর রা. থেকে আমীর মুয়াবিয়া রা. পর্যন্ত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস একথা প্রমান করে যে,কর্তৃত্ব লাভের জন্যে যুদ্ধ বিগ্রহ এবং রক্তপাত ঘটনা কখনো তাঁদের নীতি ছিল না।

তৎকালে হযরত ইমাম হোসাইন রা. এর দৃষ্টি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি, প্রানশক্তি এবং ব্যবস্থার মধ্যে বিরাট পরিবর্তনের পূর্বাভাস লক্ষ্য করছিলেন এবং এর গতিরোধ করার জন্য সবধরনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া তাঁর নিকট অত্যধিক প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। ইয়াযিদের যৌবরাজ্যে অধিষ্টা,তারপর সিংহাসনারোহনের ফলে আসলে যে ত্রুটির সূচনা হচ্ছিল,তা ছিল ইসলামের ইতিহাসে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা, তার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের পরিবর্তন। ইমাম হোসাইন রা. এর ভূমিকা ছিল একজন মুমিন হিসেবে ঈমানের দাবী।

৬০ হিজরিতে ইরাক বাসীদের নিকট সংবাদ পৌঁছল যে, হোসাইন রা. ইয়াযিদ বিন মুয়াবিয়ার হাতে বাইয়াত করেন নি। তারা তাঁর নিকট চিঠি-পত্র পাঠিয়ে জানিয়ে দিল যে ইরাক বাসীরা তাঁর হাতে খেলাফতের বাইয়াত করতে আগ্রহী। ইয়াযিদকে তারা সমর্থন করেন না বলেও সাফ জানিয়ে দিল। তারা আরও বলল যে, ইরাক বাসীরা ইয়াযিদের পিতা মুয়াবিয়া রা. এর প্রতিও মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। চিঠির পর চিঠি আসতে লাগল। এভাবে পাঁচ শতাধিক চিঠি হুসাইন রা.এর কাছে এসে জমা হল।

প্রকৃত অবস্থা যাচাই করার জন্য হোসাইন রা. তাঁর চাচাতো ভাই মুসলিম বিন আকীলকে পাঠালেন। মুসলিম কুফায় গিয়ে পৌঁছলেন। গিয়ে দেখলেন, আসলেই লোকেরা হোসাইনকে চাচ্ছে। লোকেরা মুসলিমের হাতেই হোসাইনের পক্ষে বাইয়াত নেওয়া শুরু করল। হানী বিন উরওয়ার ঘরে বাইয়াত সম্পন্ন হল।

সিরিয়াতে ইয়াযিদের নিকট এই খবর পৌঁছা মাত্র বসরার গভর্নর উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদকে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য পাঠালেন। ইয়াযিদ উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদকে আদেশ দিলেন যে, তিনি যেন কুফা বাসীকে তার বিরুদ্ধে হুসাইনের সাথে যোগ দিয়ে বিদ্রোহ করতে নিষেধ করেন। সে হুসাইনকে হত্যা করার আদেশ দেন নি।

উবাইদুল্লাহ কুফায় গিয়ে পৌঁছলেন। তিনি বিষয়টি তদন্ত করতে লাগলেন এবং মানুষকে জিজ্ঞেস করতে শুরু করলেন। পরিশেষে তিনি নিশ্চিত হলেন যে, হানী বিন উরওয়ার ঘরে হুসাইনের পক্ষে বয়াত নেওয়া হচ্ছে।

অতঃপর মুসলিম বিন আকীল চার হাজার সমর্থক নিয়ে অগ্রসর হয়ে দ্বিপ্রহরের সময় উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদের প্রাসাদ ঘেরাও করলেন। এ সময় উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ দাঁড়িয়ে এক ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি ইয়াযিদের সেনা বাহিনীর ভয় দেখালেন। তিনি এমন ভীতি প্রদর্শন করলেন যে, লোকেরা ইয়াযিদের ধরপাকড় এবং শাস্তির ভয়ে আস্তে আস্তে পলায়ন করতে শুরু করল। কুফা বাসীদের চার হাজার লোক পালাতে পালাতে এক পর্যায়ে মুসলিম বিন আকীলের সাথে মাত্র তিন জন লোক অবশিষ্ট রইল। সূর্য অস্ত যাওয়ার পর মুসলিম বিন আকীল দেখলেন, হুসাইন প্রেমিক আল্লাহর একজন বান্দাও তার সাথে অবশিষ্ট নেই। এবার তাকে গ্রেপ্তার করা হল। উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ তাকে হত্যার আদেশ দিলেন। মুসলিম বিন আকীল উবাইদুল্লাহ এর নিকট আবেদন করলেন, তাকে যেন হুসাইনের নিকট একটি চিঠি পাঠানোর অনুমতি দেয়া হয়। এতে উবাইদুল্লাহ রাজী হলেন। চিঠির সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ছিল এ রকম:

হোসাইন! পরিবার-পরিজন নিয়ে ফেরত যাও। কুফা বাসীদের ধোঁকায় পড়ো না। কেননা তারা তোমার সাথে মিথ্যা বলেছে। আমার সাথেও তারা সত্য বলেনি। আমার দেয়া এই তথ্য মিথ্যা নয়।

অতঃপর যুল হজ্জ মাসের ৯ তারিখ আরাফা দিবসে উবাইদুল্লাহ মুসলিমকে হত্যার আদেশ প্রদান করেন। এখানে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, মুসলিম ইতিপূর্বে কুফা বাসীদের ওয়াদার উপর ভিত্তি করে হুসাইনকে আগমনের জন্য চিঠি পাঠিয়েছিলেন। সেই চিঠির উপর ভিত্তি করে যুলহাজ্জ মাসের ৮ তারিখে হুসাইন রা. মক্কা থেকে কুফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিলেন। অনেক সাহাবী তাঁকে বের হতে নিষেধ করেছিলেন। তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর, আব্দুল্লাহ বিন আমর এবং তাঁর ভাই মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফীয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইবনে উমর হোসাইনকে লক্ষ্য করে বলেন: হুসাইন! আমি তোমাকে একটি হাদীস শুনাবো। জিবরীল আ: আগমন করে নবী সা দুনিয়া এবং আখিরাত এ দুটি থেকে যে কোন একটি গ্রহণ করার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তিনি দুনিয়া বাদ দিয়ে আখিরাতকে বেছে নিয়েছেন। আর তুমি তাঁর অংশ। আল্লাহর শপথ! তোমাদের কেউ কখনই দুনিয়ার সম্পদ লাভে সক্ষম হবেন না। তোমাদের ভালর জন্যই আল্লাহ তোমাদেরকে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস থেকে ফিরিয়ে রেখেছেন। হোসাইন তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এবং যাত্রা বিরতি করতে অস্বীকার করলেন। অতঃপর ইবনে উমর হোসাইনের সাথে আলিঙ্গন করে বিদায় দিলেন এবং ক্রন্দন করলেন।

সুফীয়ান ছাওরী ইবনে আব্বাস রা. থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস রা. হোসাইনকে বলেছেন: মানুষের দোষারোপের ভয় না থাকলে আমি তোমার ঘাড়ে ধরে বিরত রাখতাম।

বের হওয়ার সময় আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. হোসাইনকে বলেছেন: হোসাইন! কোথায় যাও? এমন লোকদের কাছে, যারা তোমার পিতাকে হত্যা করেছে এবং তোমার ভাইকে আঘাত করেছে?

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেছেন: হোসাইন তাঁর জন্য নির্ধারিত ফয়সালার দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছেন। আল্লাহর শপথ! তাঁর বের হওয়ার সময় আমি যদি উপস্থিত থাকতাম, তাহলে কখনই তাকে যেতে দিতাম না। তবে বল প্রয়োগ করে আমাকে পরাজিত করলে সে কথা ভিন্ন। (ইয়াহ্-ইয়া ইবনে মাঈন সহীস সূত্রে বর্ণনা করেছেন)

যাত্রা পথে হোসাইনের কাছে মুসলিমের সেই চিঠি এসে পৌঁছল। চিঠির বিষয় অবগত হয়ে তিনি কুফার পথ পরিহার করে ইয়াযিদের কাছে যাওয়ার জন্য সিরিয়ার পথে অগ্রসর হতে থাকলেন। পথিমধ্যে ইয়াযিদের সৈন্যরা আমর বিন সাদ, সীমার বিন যুল জাওশান এবং হুসাইন বিন তামীমের নেতৃত্বে কারবালার প্রান্তরে হুসাইনের গতিরোধ করল।

সৈন্য সংখ্যার দিক থেকে হোসাইনের সাথী ও ইয়াযিদের সৈনিকদের মধ্যে বিরাট ব্যবধান ছিল। হোসাইনের সামনেই তাঁর সকল সাথী বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে নিহত হলেন। অবশেষে তিনি ছাড়া আর কেউ জীবিত রইলেন না। তিনি ছিলেন সিংহের মত সাহসী বীর। কিন্তু সংখ্যাধিক্যের মুকাবিলায় তার পক্ষে ময়দানে টিকে থাকা সম্ভব হল না। কুফা বাসী প্রতিটি সৈনিকের কামনা ছিল সে ছাড়া অন্য কেউ হোসাইনকে হত্যা করে ফেলুক। যাতে তার হাত রাসূলের দৌহিত্রের রক্তে রঙ্গিন না হয়। পরিশেষে নিকৃষ্ট এক ব্যক্তি হোসাইনকে হত্যার জন্য উদ্যত হয়। তার নাম ছিল সীমার বিন যুল জাওশান। সে বর্শা দিয়ে হোসাইনের শরীরে আঘাত করে ধরাশায়ী করে ফেলল। অতঃপর ইয়াযিদ বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণে তিনি শাহাদাত অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করেন।বলা হয় এই সীমারই হোসাইনের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। কেউ কেই বলেন: সিনান বিন আনাস আন্ নাখঈ নামক এক ব্যক্তি তাঁর মাথা দেহ থেকে আলাদা করে।

আল্লাহই ভাল জানেন।

কারবালায় কী ঘটেছিল?

৬১ হিজরির ২রা মহররম, হুসাইন (রাঃ) এবং তার সঙ্গীরা কারবালায় (ইরাকে অবস্থিত) পৌঁছান। কিন্তু উমর ইবনে সাদের নেতৃত্বে ইয়াজিদের ৪০০০ সৈন্যবাহিনী তাদের বাধা দেয়। হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ) এবং তার সঙ্গীরা দীর্ঘ সময় ধরে ভ্রমণ করার কারণে তারা ক্লান্ত এবং তৃষ্ণার্ত ছিল। কিন্তু ইবনে সাদের সেনাবাহিনী ফোরাত নদীর কাছে পানি সংগ্রহের জন্য তাদের কাছে পৌঁছায়নি। তাই, পানির অভাবে শিশু, মহিলা এবং অন্যান্যরা অনেক কষ্টে ভুগছিল। ইবনে সাদের সেনাবাহিনী পরবর্তী কয়েক দিনের মধ্যে হুসাইনের (রাঃ) সঙ্গীদের ঘিরে ফেলে এবং আক্রমণ করে।
কারবালা যুদ্ধের আগের রাতে, হুসাইন (রাঃ) ঘোষণা করেন যে, যদি তার দলের কেউ মক্কায় ফিরে যেতে চায়, তাহলে তা করা হবে কারণ তারা শীঘ্রই ইয়াজিদের বাহিনীর হাতে নিহত হবে। কিন্তু তার সাথে থাকা সকলেই এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকা পর্যন্ত হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ) এর পাশে থাকতে প্রস্তুত ছিল। সুবহানআল্লাহ, নেতার মতো, অনুসারীদের মতো, ধার্মিক মুসলমানদের উদাহরণ।

৩রা মহররম তারিখে ইবনে সাদ হুসাইন (রাঃ) কে ইয়াজিদের প্রতি আনুগত্য করতে অথবা আত্মসমর্পণ করতে বলেন। কিন্তু তিনি (রাঃ) আগের মতোই তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন যে ইয়াজিদের প্রতি আনুগত্য করার চেয়ে মৃত্যু আমার কাছে ভালো। ৭ই মহররম থেকে ইয়াজিদের সেনাবাহিনী পানির উৎস সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়। ফলে, পানির অভাবে হুসাইন (রাঃ) এর শিবির ভয়াবহভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তবে, তারা তাদের পথ ছেড়ে দেয়নি।

১০ই মহররম রাতে, হুসাইন (রাঃ) এবং তার সঙ্গীরা আল্লাহর কাছে গভীর ইবাদত করেন এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। ১০ই মহররম ফজরের নামাজের পর, হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ) একটি ভাষণ দেন। তিনি (রাঃ) ইয়াজিদের সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমরা এখানে যুদ্ধ করতে বা ইয়াজিদের ক্ষমতা দখল করতে আসিনি। তিনি আরও বলেন যে, তোমরা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলে বলেই আমরা এখানে এসেছি; এখন তোমরা আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছো। হুসাইন (রাঃ) তাদের বললেন, তাকে তার সঙ্গী এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে মদীনা অথবা যেকোনো ইসলামী সীমান্তে ফিরে যেতে দিন যাতে আমরা সেখানে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারি অথবা আমাকে ইয়াজিদের সাথে দেখা করতে যেতে দিন; আমি তার সাথে কথা বলতে পারতাম। কিন্তু ইয়াজিদের সেনাবাহিনী তা প্রত্যাখ্যান করে। ফলস্বরূপ, কারবালায় যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু ইয়াজিদের সেনাবাহিনীর কিছু লোক, যেমন আল-হুর ইবনে ইয়াজিদ আল-তামিমি, তাকে রক্ষা করার জন্য হুসাইনের (রাঃ) পক্ষে যোগ দেয়।

কারবালায় কী ঘটেছিল?

১০ই মহররমের সকাল থেকেই ইবনে সাদের সেনাবাহিনী হুসাইন (রাঃ) এবং তার সঙ্গীদের উপর আক্রমণ শুরু করে। হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ) ছিলেন আসাদুল্লাহ আল-গালিব আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) এর সাহসী পুত্র। ৪০০০ ইয়াজিদ বাহিনীর তুলনায় হুসাইন (রাঃ) এবং তার সঙ্গীদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। তবে, তারা সকলেই সাহসের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন এবং অবশেষে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। আল্লাহ তাদের সকলের উপর রহম করুন।

ইয়াজিদের সেনাবাহিনী হুসাইন (রাঃ) এর পক্ষের নারী, শিশু এমনকি শিশুকেও নির্মমভাবে হত্যা করেছিল (হুসাইন (রাঃ) এর সঙ্গীদের প্রায় ৭২ জন)। আল-হাসান আল-বাসরী বলেছেন বলে জানা যায়: "হুসাইন (রাঃ) এর সাথে আরও ষোল জন পুরুষ নিহত হয়েছিল, যাদের সকলেই তার আহলে বাইত (তার পরিবারের সদস্য) থেকে ছিল"। তখন কেবল হুসাইন (রাঃ) এর পুত্র জয়নুল আবেদীন জীবিত ছিলেন, কারণ তিনি অসুস্থতার কারণে সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

আসলে কেউ হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ)-এর হত্যার জন্য দোষী সাব্যস্ত করতে চায়নি। তবে, বনু বাদ্দা গোত্রের মালিক বিন আন-নুসাইর নামে এক ব্যক্তি এসে তার মাথায় তরবারি দিয়ে আঘাত করে যার ফলে রক্তক্ষরণ হয়। হুসাইন (রাঃ)-এর মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধেন, কিন্তু শীঘ্রই তা রক্তে ভরে যায়। আল-হুসাইন (রাঃ)-এর খুব তৃষ্ণার্ত অবস্থা ছিল, তাই তিনি পানি পান করার জন্য মরিয়া হয়ে ফোরাত নদীর তীরে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেননি। একটি তীর তাকে আঘাত করে যা হুসাইন (রাঃ)-এর গলায় বিদ্ধ করে।এরপর হোসাইন ইবনে আলী (রাঃ) তাঁর রক্তাক্ত হাত তুলে প্রার্থনা করেন: "হে আল্লাহ! তাদেরকে বহুবার তাদের প্রতিশোধ দিন, তারা যেখানেই থাকুক না কেন হত্যা করুন এবং তাদের একজনকেও পৃথিবীতে অবশিষ্ট রাখবেন না!" তিনি এভাবে প্রার্থনা করতে থাকেন।

এরপর, সিমারের ক্রমানুসারে সিনান ইবনে আনাস নামে এক পাপী হুসাইন ইবনে আলীর শিরশ্ছেদ করে। শাহাদাতের পর দেখা গেল যে, হুসাইন (রাঃ)-এর শরীরে মোট ৩৪টি তরবারি এবং ৩৩টি বর্শার ক্ষত ছিল।

কারবালার প্রান্তরে হোসাইনের সাথে আরও যারা নিহত হয়েছেন:

• আলী রা.এর সন্তানদের মধ্যে থেকে আবু বকর, মুহাম্মাদ, উসমান, জাফর এবং আব্বাস।
• হোসাইনের সন্তানদের মধ্যে হতে আবু বকর, উমর, উসমান, আলী আকবার এবং আব্দুল্লাহ।
• হাসানের সন্তানদের মধ্যে হতে আবু বকর, উমর, আব্দুল্লাহ এবং কাসেম।
• আকীলের সন্তানদের মধ্যে হতে জাফর, আব্দুর রাহমান এবং আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম বিন আকীল।
• আব্দুল্লাহ বিন জাফরের সন্তানদের মধ্যে হতে আউন এবং আব্দুল্লাহ। ইতি পূর্বে উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদের নির্দেশে মুসলিম বিন আকীলকে হত্যা করা হয়। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন। আমীন

হোসাইন রা. এর মাথা কোথায় গিয়েছিল?

দামেস্কে ইয়াযিদের দরবারে হোসাইনের মাথা প্রেরণের বর্ণনা সহীহ সূত্রে প্রমাণিত হয় নি। বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, তিনি কারবালার প্রান্তরে শহীদ হয়েছেন। তাঁর সম্মানিত মাথা কুফার গভর্নর উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। আনাস বিন মালিক রা. বলেন: হোসাইনের মাথা উবাইদুল্লাহ এর কাছে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি তাঁর মাথাকে একটি থালার মধ্যে রেখে একটি কাঠি হাতে নিয়ে তা নাকের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন এবং তাঁর সৌন্দর্য দেখে সম্ভবত বেখেয়ালে কিছুটা বর্ণনাও করে ফেলেছিলেন। হাদীসের শেষের দিকে আনাস রা. বলেন: হোসাইন রা. ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সবচেয়ে বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ। (বুখারী)
অন্য বর্ণনায় আছে, আনাস রা. বলেন: আমি উবাইদুল্লাহকে বললাম, তোমার হাতের কাঠি হুসাইনের মাথা থেকে উঠিয়ে ফেল। কারণ আমি তোমার কাঠি রাখার স্থানে রাসূলের পবিত্র মুখ দিয়ে চুমু খেতে দেখেছি। এতে কাঠি সংকোচিত হয়ে গেল। (দেখুন: ফতহুল বারী ৭/৯৬)
সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এরপর কোথায় হোসাইনের কবর হয়েছে এবং তাঁর মাথা কোথায় গিয়েছে, তা সঠিক সূত্রের মাধ্যমে জানা যায় নি। প্রকৃত ও সঠিক জ্ঞান আল্লাহর নিকটেই।

ইমাম হোসাইনের রা. এর কারবালার ঘটনা থেকে শিক্ষা

১। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, দেশের মালিক আল্লাহ,জনসাধারন আল্লাহর প্রজা এবং এই প্রজা পালনের ব্যাপারে রাষ্ট্রকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহী করতে হবে। রাষ্ট্র প্রধানদের কাজ হলো সর্বপ্রথম আল্লাহর বন্দেগী ও দাসত্বে নিজেদের সঁপে দেয়া। এই কথা মুখে উচ্চারনের সাথে মনে প্রানে মেনে নেয়া ও কাজের মাধ্যমে তার প্রমান পেশ করা।

এই অবস্থার পরিবর্তন হতে যাচ্ছে দেখেই ইমাম হোসাইন রা. ঈমানের দাবী পূরন করার লক্ষ্যে যা ইসলামের ইতিহাসকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করবে সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

২। ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হলো,আল্লাহর পৃথিবীতে তাঁরই পছন্দের সৎবৃত্তিগুলোর প্রতিষ্ঠা এবং প্রসার আর অসৎবৃত্তিগুলোর পথরোধ ও বিলুপ্ত সাধন।

কিন্তু এর বিপরীতে মানব রচিত রাজতন্ত্র দিয়ে মানুষের উপর মানুষের প্রভূত্ব, বিলাসী জীবন যাপন ইত্যাদিসহ ধাপে ধাপে নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে অগ্রসর হতে থাকে শাসক গোষ্ঠীসহ সমাজের কিছু ব্যক্তিবর্গও।

৩। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রান শক্তি হলো তাকওয়া বা আল্লাহভীতি।

কিন্তু ইমাম হোসাইন লক্ষ্য করলেন যে আভ্যন্তরিণ পরিবর্তণ শুরু হয়ে গিয়েছে এই রাজতন্ত্র দ্বারা। ইনসাফের পরিবর্তে জুলুম ও নিপীড়ন,আল্লাহভীতির পরিবর্তে উচ্ছৃংখলতা,চরিত্রহীনতা,গান বাজনা এবং বিলাসিতার স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। মানুষের ঈমান ও বিবেককে জাগ্রত করার পরিবর্তে বখশিশের লোভ দেখিয়ে বেচা কেনা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

৪। ইসলামী শাসনতন্ত্রের বুনিয়াদী ধারাই পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছিল।

- সাধারন মানুষের স্বাধীন মতামত এবং সাধারন মানুষের আনুগত্য নিয়েই কর্তৃত্বের আসনে সমাসীন হবে।
- পরামর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে এবং পরামর্শ করতে হবে ইলম, তাকওয়া এবং নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌছার মত বুদ্ধিবৃত্তির উপর, যাদের উপর সাধারন মানুষের আস্থা আছে।
- সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের প্রতিরোধ করা প্রত্যেক মুসলমানের অধিকার ও কর্তব্য,এর পূর্ণ স্বাধীনতা থাকতে হবে।
- শাসক গোষ্ঠী এবং তার রাষ্ট্রকে আল্লাহর এবং সাধারন মানুষের নিকট জবাবদিহী করতে হবে।
- বায়তুলমাল আল্লাহর সম্পত্তি এবং মুসলমানের আমানত। আল্লাহর নির্দেশিত পথ ছাড়া অন্য কোন পথে আয় বা ব্যয় করতে পারবে না।
- দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত থাকবে,আল্লাহ ও রাসূলের স. আইন সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে।
- অধিকার ও মর্যাদার দিক দিয়ে পূর্ণ সাম্যের প্রতিষ্ঠা থাকবে। একজন অন্যজনের চাইতে শ্রেষ্ঠ হতেন শুধু চরিত্র,নৈতিক যোগ্যতা এবং জনসেবার কারনে।

ইমাম হোসাইন রা. বুঝতে পেরেছিলেন যে ধীরে ধীরে এইসব ধারা ইসলামী রাষ্ট্র থেকে বিলুপ্ত হতে থাকবে,তাই তিনি পেরেশান হয়েছিলেন।
একজন মুমিনের দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদী নীতিগুলোর সংরক্ষণ করার জন্য জান ও মালকে ব্যবহার করা।
আল্লাহর পথে জিহাদ করো যেমন জিহাদ করলে তার হক আদায় হয়। তিনি নিজের কাজের জন্য তোমাদেরকে বাছাই করে নিয়েছেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোন সংকীর্ণতা আরোপ করেননি। তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও। আল্লাহ আগেও তোমাদের নাম রেখেছিলেন “মুসলিম” এবং এর (কুরআন) মধ্যেও (তোমাদের নাম এটিই) যাতে রসূল তোমাদের ওপর সাক্ষী হন এবং তোমরা সাক্ষী হও লোকদের ওপর। কাজেই নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাও। তিনি তোমাদের অভিভাবক, বড়ই ভালো অভিভাবক তিনি, বড়ই ভালো সাহায্যকারী তিনি। আল হাজ্জঃ ৭৮

কারবালার ঘটনার সাথে আশুরার কি সম্পর্ক ?

সমাজে প্রচলিত শিক্ষায় আশুরার মূল বিষয় বলে কারবালার ঘটনাকেই বুঝানো হচ্ছে। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিকোণ থেকে এটা সঠিক নয়। ইসলামের আগমনের পূর্বে আশুরা ছিল। যেমন আমরা হাদীস দ্বারা জানতে পেরেছি। তখন মক্কার মুশরিকরা যেমন আশুরার সাওম পালন করত তেমনি ইহুদীরা মুসা আ. এর বিজয়ের স্মরণে আশুরার সাওম পালন করত।

আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আশুরার সাওম পালন করেছেন জীবনের প্রতিটি বছর। তার ইন্তেকালের পর তার সাহাবায়ে কেরাম রা. আশুরার সাওম পালন করেছেন।

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইন্তেকালের প্রায় পঞ্চাশ বছর পর হিজরী ৬১ সালে কারবালার ময়দানে জান্নাতী যুবকদের নেতা, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রিয় নাতী সাইয়েদুনা হুসাইন রা. শাহাদাত বরণ করেন। ইসলামের ইতিহাসে মুসলিম উম্মাহর জন্য এটা একটা হৃদয় বিদারক ঘটনা। ঘটনাক্রমে এ মর্মান্তিক ইতিহাস এ আশুরার দিনে সংঘঠিত হয়েছিল। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তার সাহাবায়ে কেরাম যে আশুরা পালন করেছেন ও যে আশুরা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য রেখে গেছেন তাতে কারবালার ঘটনার কোন ভূমিকা ছিলনা। থাকার প্রশ্নই আসতে পারেনা। কারবালার এ দুঃখজনক ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহবাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. আব্দুল্লাহ বিন উমার রা. আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. আনাস বিন মালেক রা. আবু সাঈদ খুদরী রা. জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা. সাহল বিন সায়াদ রা. যায়েদ বিন আরকাম রা. সালামাতা ইবনুল আওকা রা. সহ বহু সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম জীবিত ছিলেন। তারা তাদের পরবর্তী লোকদের চেয়ে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তার পরিবারবর্গকে অনেক বেশী ভালবাসতেন। তারা আশুরার দিনে কারবালার ঘটনার স্মরণে কোন কিছুর প্রচলন করেননি।

হুসাইনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আলী বিন হুসাইন, মুহাম্মাদ এবং জাফর জীবিত ছিলেন। তাদের কেউ হুসাইনের মৃত্যুতে মাতম করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আজ যারা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর আহলে বাইতের মহব্বত ও ভালবাসার নামে কান্নাকাটি করেন,তাযিয়া করেন, মীলাদ পড়েন আরো অনেক কিছু করেন যা তিনি করতে বলেননি। তাঁর মহব্বতে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে তাঁর আদেশ পর্যন্ত লংঘন করেন। বিভিন্ন বিদ'আতী কাজ-কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁর আদর্শ অনুসরণ ও বাস্তবায়নের কোন প্রয়োজন অনুভব করেন না।

যে মুসলিম আল্লাহকে ভয় করে তার জন্য হুসাইনের নিহত হওয়ার ঘটনা স্মরণ করে বিলাপ করা, শরীর জখম করা, গাল, মাথা ও বুক থাবড়ানো বা এ রকম অন্য কিছু করা জায়েজ নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: যে ব্যক্তি মুসীবতে পড়ে নিজ গালে চপেটাঘাত করল এবং শরীরের কাপড় ছিঁড়ল, সে আমাদের দলের নয়। সহিহ বুখারী

তিনি আরও বলেন: মুসীবতে পড়ে বিলাপকারী, মাথা মুন্ডনকারী এবং কাপড় ও শরীর কর্তনকারীর সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন: মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপকারী যদি তওবা না করে মারা যায়, তাকে কিয়ামতের দিন খাঁজলীযুক্ত (লোহার কাঁটাযুক্ত) কোর্তা পড়ানো হবে এবং আলকাতরার প্রলেপ লাগানো পায়জামা পড়ানো হবে। সহিহ মুসলিম। তিনি আরও বলেন: আমার উম্মতের মধ্যে জাহেলী যুগের চারটি স্বভাব বিদ্যমান রয়েছে। তারা তা ছাড়তে পারবে না।

(১) বংশ মর্যাদা নিয়ে গর্ব করা,

(২) মানুষের বংশের নাম তুলে দুর্নাম করা,

(৩) তারকারাজির মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা এবং

(৪) মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ করা। "মানুষের মাঝে দুটি জিনিষ রয়েছে, যা কুফরীর অন্তর্ভুক্ত। মানুষের বংশের বদনাম করা এবং মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ করা"। সহিহ মুসলিম

তিনি আরও বলেন: মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ করা জাহেলিয়াতের অন্তর্ভুক্ত। বিলাপকারী যদি তওবা না করে মারা যায়, তাকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ আলকাতরার প্রলেপ লাগানো জামা পড়াবেন এবং অগ্নি শিখা দ্বারা নির্মিত কোর্তা পরাবেন। ইবনে মাজাহ

একজন বিবেকবান মুসলিমের উপর আবশ্যক হচ্ছে সে এ ধরণের মুসীবতের সময় আল্লাহর নির্দেশিত কথা বলবে। আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেছেন: যখন তাঁরা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তারই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো। সূরা আল বাকারাঃ ১৫৬

যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহর মাঝেই রয়েছে উত্তম আদর্শ।

আল-আহযাব: ২১

জাযাকুমুল্লাহি খাইরান

Sisters’Forum In Islam.com

আর রাসূল তোমাদের জন্য যা দিয়েছেন তা তোমরা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও।

সূরা হাশর: ৭